দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে
আমার রমাদান,আপণ সাথী আল-কুর’আন

কুর’আন মাজীদঃ ৭ম পারা

মোট রুকুঃ ১৮রুকু

সূরা সমূহঃ মায়িদাঃ (১২-১৬) রুকু

আন’আমঃ(১-১৩)রুকু

Sisters’ Forum In Islam.com

সূরা মায়িদাঃ ১২তম রুকু(৮৭-৯৩) আয়াত: ১ম স্লাইড

১। প্রথমেই দু'টি কথা বলা হয়েছে।

এক, তোমরা নিজেরাই কোন জিনিস হালাল ও হারাম গণ্য করার অধিকারী হয়ে বসো না।

তাহলে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তোমরা নফসের ও প্রবৃত্তির আইনের অনুগত গণ্য হবে।

দুই, খৃষ্টীয় সন্যাসী, হিন্দু যোগী, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ইশরাকী তাসাউফ পন্থীদের মতো বৈরাগ্য, সংসার বিমুখতা ও দনিয়ার বৈধ স্বাধ আস্বাদন পরিহার করার পদ্ধতি অবলম্বন করো না।

আত্মসংযমের জন্য ইসলামে আছে রোযা। সংসারত্যাগী জীবনের সমস্ত ফায়দা লাভ করা হয় জিহাদের মাধ্যমে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূল (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যখনই গোশত ভক্ষণ করি, তখনই আমার মধ্যে কামোত্তেজনা অনুভব করি। তাই নিজের জন্য গোশতকে হারাম করে নিয়েছি।' যার ফলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সহীহ তিরমিযী, আলবানী ৩/৪৬)

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তার কাছে একবার খাবার নিয়ে আসা হলো। একলোক খাবার দেখে একদিকে আলাদা হয়ে গেল এবং বলল, আমি এটা খাওয়া হারাম করছি। তখন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বললেন, কাছে আস এবং খাও। আর তোমার শপথের কাফফারা দাও। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩১৩, ৩১৪; ফাতহুল বারী ১১/৫৭৫]

সীমালংঘন করার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। হালালকে হারাম করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত পাক-পবিত্র জিনিসগুলো থেকে এমনভাবে দূরে সরে থাকা যেন সেগুলো নাপাক, এটাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। তারপর পাক পবিত্র জিনিসগুলো অযথা ও অপ্রয়োজনে ব্যয় করা, অপচয় ও অপব্যয় করা এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ও প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। আবার হালালের সীমা পেরিয়ে হারামের সীমানায় প্রবেশ করাও বাড়াবাড়ি। এ তিনটি কাজই আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।

২।) قسم কসম) এর আরবী প্রতিশব্দ حلفবা يمين আর বহুবচন أحلافবা أيمان যা শপথ অর্থে ব্যবহার হয়। এই কসম বা শপথ তিন ভাগে বিভক্ত; (ক)) لغوখ)) غموسগ)) مُعقَّدةক)) لَغْوনিরর্থক বা নিরুদ্দেশ) এমন কসম, যা মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং কথায় কথায় ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ছাড়াই ব্যবহার করে। এই ধরনের কসমের কোন কাফফারা বা ধর-পাকড় নেই। (খ)) غموسমিথ্যা কসম) যা মানুষ ধোঁকা দেওয়া ও প্রতারণা করার জন্য করে থাকে। এটা মহাপাপ; বরং অতি মহাপাপ। কিন্তু এ ধরনের কসমের কোন কাফফারা নেই। (গ) معقَّدةঐ কসমকে বলা হয়, যা মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং নিয়ত সহকারে নিজের কথার সত্যতার তাকীদ ও তা পাকা করার জন্য ব্যবহার করে। যদি কেউ এ ধরনের কসম ভঙ্গ করে, তাহলে তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে। কাফফারা আদায় করতে হবে--- তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করতে হবে। (১) দশ জন দরিদ্রকে মধ্যশ্রেণীর খাদ্য সকাল-বিকাল দুবেলা খাওয়াতে হবে কিংবা (২) দশ জন দরিদ্রকে সতর ঢাকা পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণতঃ একটি পাজামা অথবা একটি লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্তা কিংবা (৩) কোন গোলামকে মুক্ত করে দেয়া। [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

প্রত্যেক মিসকীনকে এক 'মুদ' (প্রায় ৬২৫ গ্রাম) খাদ্য দান করতে হবে। ১০ মিসকীনকে ১০ মুদ করে (অর্থাৎ প্রায় সওয়া ৬ কিলো) খাদ্যদ্রব্য কাফফারা হিসাবে প্রদান করতে হবে। ((মতান্তরে মাথাপিছু দু মুদ (সওয়া এক কিলো) খাদ্য দান করতে হবে।

কা'ব বিন উজরার ইহরাম অবস্থায় মাথায় উকুন হলে মহানবী (সাঃ) তাঁকে বলেন, ''তোমার মাথা মুন্ডন করে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ, কিংবা প্রত্যেক মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধ সা' (মোটামুটি সওয়া এক কিলো) করে ছয়টি মিসকীনকে খাদ্য দান কর, কিংবা একটি ছাগল কুরবানী কর।'' (বুখারী ১৮১৬, মুসলিম ১২০১নং)

''কোন শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি এ আর্থিক কাফফারা দিতে সমর্থ না হয়, তবে তার জন্য কাফফারা এই যে সে তিন দিন রোযা রাখবে''। কোন কোন বর্ণনায় এখানে ধারাবাহিকভাবে তিনটি সিয়াম রাখার নির্দেশ রয়েছে।

সূরা মায়িদাঃ ১২তম রুকু(৮৭-৯৩) আয়াত: ২য় স্লাইড

৩। এটি মদের ব্যাপারে তৃতীয় নির্দেশ। প্রথম ও দ্বিতীয় নির্দেশে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু এখানে মদ ও তার সাথে জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক তীরকে অপবিত্র বা ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানী বিষয় বলে স্পষ্ট ভাষায় তা থেকে দূরে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে।মদ সংক্রান্ত আয়াত-প্রথম আয়াতঃ [বাকারাহ: ২১৯] দ্বিতীয়ঃ[সূরা আন-নিসাঃ ৪৩]
যাঁরা মু'মিন ছিলেন, তাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্য বুঝে গেলেন এবং তা যে নিশ্চিত হারাম, তা মেনে নিয়ে বললেন, 'আমরা বিরত হলাম, হে আমাদের প্রতিপালক!' (আহমাদ ২/৩৫১)
আনাস রা তখন এক মজলিশে মদ্যপানে সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবু তালহা, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাই ইবন কা'ব, সোহাইল রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখ নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ সে মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন - এবার সমস্ত মদ ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাড়ি ভেঙ্গে ফেল। [মুসনাদে আহমাদ ৩/১৮১; বুখারী ৪৬২০; মুসলিম: ১৯৮০]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন। (১) যে লোক নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারক, (৩) পানকারী, (৪) যে পান করায়, (৫) আমদানীকারক, (৬) যার জন্য আমদানী করা হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) সরবরাহকারী এবং (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী। [ইবন মাজাহঃ ৩৩৮০]
৪। মদ জুয়ার মাধ্য শয়তান যা ঘটাতে চায়- পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে, আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা প্রদান করা। তাই আল্লাহ এই ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। ৫। আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর সাবধানতা অবলম্বন কর; তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমাদের রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।
৬। ইবনে আব্বাস রা বলেন, রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, যা-ই বিবেকশূণ্য করে তা-ই মদ। আর সমস্ত মাদকতাই হারাম। যে ব্যক্তি কোন মাদক সেবন করল, চল্লিশ প্রভাত পর্যন্ত তার সালাত অসম্পূর্ণ থাকবে। তারপর যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন, এভাবে চতুর্থবার পর্যন্ত। যদি চতুর্থবার পূণরায় তা করে, তখন আল্লাহর উপর হক হয়ে দাঁড়ায় তাকে ত্বিনাতুল খাবাল থেকে পান করানো। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! ত্বিনাতুল খাবাল কী? তিনি বললেন, জাহান্নামাবাসীদের পূজ। যে কেউ কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ককে মদ খাওয়াবে, যে হারাম হালাল সম্পর্কে জানে না, আল্লাহর উপর হক হয়ে যাবে যে তাকে ত্বীনাতুল খাবাল পান করানো। [মুসলিম: ২০০২: আবু দাউদ ৩৬৮০]
রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, অনুগ্রহের খোটাদানকারী, পিতামাতার অবাধ্য এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [নাসায়ী: ৫৬৭২]
৭। বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয় তখন জনগণ বলতে আরম্ভ করল, এটা হারাম হওয়ার পূর্বে যারা এটা পান করেছে এবং সে অবস্থায় মারা গেছেন তাদের কি হবে? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [তিরমিযী: ৩০৫১]
যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা আগে যা কিছু পানাহার করেছে তার জন্য তাদের কোন গুনাহ নেই, যদি তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে। তারপর তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে। তারপর তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ইহসান করে। আর আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন।

সূরা মায়িদাঃ ১৩তম রুকু(৯৪-১০০) আয়াত

১। শিকার করা আরববাসীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা ছিল। আর সে জন্যই ইহরাম অবস্থায় তা নিষিদ্ধ করে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিশেষ করে হুদায়বিয়ায় অবস্থান কালে সাহাবাদের নিকট অধিকহারে শিকার সেখানে বন্য চতুষ্পদ জন্তু, পাখী এবং অন্যান্য শিকার তাদের অবস্থানস্থলে আসতে থাকে, আর সে সময় এই চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে এই সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে । আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট করে দেন যে, কে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছে, আর কে করছে না

২। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নিজে শিকার করা বা অন্যকে শিকারে(স্থলজ প্রানী) সাহায্য করা উভয়টি নিষিদ্ধ।

কোন ধরনের পশু হত্যা করলে কতজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে বা ক'টি রোযা রাখতে হবে, এর ফায়সালাও করবেন দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ।

এ হাদঈ বা জন্তু কা'বা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। সেখানেই তা জবাই করতে হবে এবং হারাম শরীফের মিসকীনদের মধ্যে ওর গোশত বন্টন করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।

যে প্রাণীগুলো ইহরাম ও সাধারণ সর্বাবস্থায় বধ করার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে, পাঁচটি। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী আছে যা ইহরাম অবস্থায় হত্যা করলে কোন পাপ হয় না। কাক, চিল, বিচ্ছু, ইদুর এবং হিংস্র কুকুর। [বুখারীঃ ১৮২৯, মুসলিমঃ ১১৯৯]

মুহরিম ব্যক্তির) কাফফারা স্বরূপ মিসকীনকে খানা খাওয়ানো অথবা রোযা রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার বা স্বাধীনতা রয়েছে; দুটির মধ্যে যে কোন একটা করা বৈধ।

৩। সামুদ্রিক সফরে অনেক সময় পাথেয় শেষ হয়ে যায় এবং আহার সংগ্রহের জন্য জলজ প্রাণী শিকার করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না, তাই সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হয়েছে ।

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

৪। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শান্তির কারণ বলে উল্লেখ করছেন। প্রথমতঃ কা'বা। এর দ্বারা মক্কাবাসীর নিয়ম-শৃংখলা ও সমাজ-ব্যবস্থা ভালো থাকে এবং তাদের অর্থনৈতিক ও জৈবিক চাহিদা পূরণের উপায়ও লাভ হয়।

দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে, সম্মানিত মাস, তৃতীয় বস্তু হচ্ছে, 'হাদঈ'। হারাম শরীফে যে জন্তুকে তামাত্তু ও কেরান হজের কারণে যবাই করতে হয়, তাকে হাদঈ বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত; তাকে কেউ কিছু বলত না। চতুর্থ বস্তুটি হচ্ছে, قلائدএ শব্দটি قلادةশব্দের বহুবচন। এর অর্থ, গলার হার। আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজের উদ্দেশ্যে বের হলে চিহ্নস্বরূপ তার হাদঈর গলায় একটি হার পরিয়ে দিত। ফলে কেউ তাকে কোন কষ্ট দিত না।

৫। আল্লাহর পরিচয়ঃ নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর, আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, রাসূলের সা দায়িত্ব এতটুকুই যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে রাসূলের কোন ক্ষতি নেই। মহান আল্লাহ সকলের প্রকাশ্যে ও গোপন কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

৭। (الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ)আরবী ভাষায় দুটি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে الطَّيِّبএবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে الْخَبِيثবলা হয়। (الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ)শব্দ দুটি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ-সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর (খারাপ ও ভালো) এ দুই কখনও সমান হতে পারে না (যদিও খারাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ)।

যদিও মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদের বিস্মিত করে দেয় এবং আশ-পাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভাল মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটি বিশেষ। মন্দ বস্তু কখনও ভাল হতে পারে না। সুতরাং উপকারী হালাল বস্তু স্বল্প হলেও তা অপকারী হারাম বস্তু বেশী হওয়ার চেয়ে উত্তম। [ফাতহুল কাদীর] অল্প ও প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট জিনিস সেই অধিক জিনিস হতে উত্তম যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল ও উদাসীন রাখে। [মুসনাদে আহমাদ ৫/১৯৭] আল্লাহ আহবান করছেন যাদের বুদ্ধি রয়েছে তাদের যে-

কাজেই হে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরা! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

Sisters' Forum In Islam.com

সূরা মায়িদাঃ ১৪তম রুকু(১০১-১০৮) আয়াতঃ ১ম স্লাইড

১। আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নুযুল এই যে, যখন হজ ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ নাযিল হয়, তখন আকরা ইবন হাবেস রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের জন্য কি প্রতি বছরই হজ করা ফরয? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন। তিনি তবুও চুপ। প্রশ্নকারী তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সুরে বললেন, যদি আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হ্যাঁ প্রতি বছরই হজ্জ ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন, যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেইনা, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দাও- ঘাটাঘাটি করে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উম্মত বেশী প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। আমি যে কাজের আদেশ দেই, সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজ নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। [মুসলিম: ১৩৩৭]

কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঠাট্টা করে প্রশ্ন করত। কেউ কেউ বলতঃ আমার বাবা কে? কেউ বলতঃ আমার উট হারিয়ে গেছে, তা কোথায় আছে? এসব ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৬২২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুসলিম হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলিম ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে। [তিরমিযীঃ ২৩১৭, ইবন মাজাহঃ ৩৯৭৬]

ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কোন দ্বীনী কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে কোন জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়। তবে যদি কোন বিধানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কোন সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসে থাকে, তবে সেটার বিস্তারিত জ্ঞান জেনে নেয়ার জন্য প্রশ্ন করা হলে সে ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা দেয়া হবে। আর যদি কোন বিষয়ে কোন বর্ণনাই না এসে থাকে, তবে সেটার ব্যাপারে নিরবতা পালন করাই হচ্ছে সঠিক নীতি। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি যতক্ষণ কোন বিষয় পরিত্যাগ করি ততক্ষণ তোমরা আমাকে ছাড় দাও; কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের নবীদেরকে বেশী প্রশ্ন এবং বেশী বাদানুবাদের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে।” [মুসলিম: ১৩৩৭]

আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে, এক. আল্লাহ তোমাদের অতীতের প্রশ্নগুলোর কারণে পাকড়াও করা ক্ষমা করেছেন। [জালালাইন] দুই. যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করছ আল্লাহ তা’আলা সেগুলোর বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে বান্দাদেরকে এর পরিণতি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারেন। [মুয়াসসার]

২। তোমাদের আগেও এক সম্প্রদায় এ রকম প্রশ্ন করেছিল; তারপর তারা তাতে কাফির হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ জানিয়েছেন। তারা বিভিন্ন বিধি-বিধান চেয়ে নিয়েছিল। তারপর সেগুলোর উপর আমল করা ত্যাগ করে কুফর করেছিল। [জালালাইন] ফলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

সূরা বাক্বারায় গাভী যবেহ করার ঘটনায় বানী ইস্রাঈল অনর্থক প্রশ্ন করেছিল।

৩। বাহিরাহ, সায়েবাহ, ওছীলাহ, হামী প্রভৃতি সবই জাহেলিয়াত যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এগুলি ঐ সকল পশুর বিভিন্ন নাম, যা আরবের বাসিন্দাগণ তাদের প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত। আমর বিন আমের খুযাঈ সর্বপ্রথম মূর্তির নামে জন্তু উৎসর্গ করার প্রথা চালু করেছিল। নবী করীম (সাঃ) বলেন, “আমি তাকে জাহান্নামে নিজ নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে টানাটানি করতে দেখেছি। বুখারী

৪। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস, তখন তারা বলে, “আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেটাতে পেয়েছি সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানত না এবং সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না

Sisters’ Forum In Islam.com

সূরা মায়িদাঃ ১৪তম রুকু(১০১-১০৮) আয়াত

৫। হে মুমিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন; তারপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।১০৫

কিছু লোকের মনে বাহ্যিক এই শব্দাবলীর কারণে সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে, নিজেকে সংশোধন করে নেওয়াই যথেষ্ট। আর সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ভাষণে বলেন, তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ। জেনে রাখ, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেছিঃ যারা কোন পাপকাজ হতে দেখেও তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ তা'আলা সত্ত্বরই হয় তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আযাবে নিক্ষেপ করবেন। [আবু দাউদঃ ৪৩৪১, তিরমিযীঃ ৩০৫৮, ইবন মাজাহঃ ৪০১৪]

তাই মুফাসসিরগণ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। সৎকাজে আদেশ দানও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

৬। যদি মুসলিম কোন সাক্ষী রাখা সম্ভবপর না হয়। কারণ, সাধারণত: সফর অবস্থায় সবসময় মুসলিমদের সাক্ষী হিসেবে পাওয়া দুস্কর। তাই প্রয়োজনের খাতিরে কাফেরদেরকে সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে। [মুয়াসসার] তবে তাদেরকে সাক্ষী রাখার ক্ষেত্রে কি নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে তা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

(মৃত ব্যক্তি) অসিয়তকারীর ওয়ারেসগণের মধ্যে যদি সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, যাদেরকে অসিয়ত করা হয়েছে তারা খেয়ানত অথবা পরিবর্তন করতে পারে, তাহলে এমতাবস্থায় নামাযের পর সমস্ত মানুষের সামনে তাদেরকে (আল্লাহর নামে) শপথ করানো হবে; তারা বলবে, 'আমরা শপথের বিনিময়ে এই নশ্বর জগতের সামান্য স্বার্থ উদ্ধার করছি না; অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করছি না।

৭। যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের পক্ষে আয়াতে দুই নিকটাত্মীয় মিথ্যা কসমের বিরুদ্ধে শপথ করবে।

ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ বনী সাহমের এক লোক তামীম আদ-দারী এবং আদী ইবনে বাদ্দারের সাথে সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে সাহমী লোকটি মারা গেল; এমন জায়গায় মারা গেল যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। তারা দু'জন তার মীরাস নিয়ে যখন ফিরে আসল, তখন আত্মীয় স্বজনরা সোনা দিয়ে মোড়ানো একটি রুপার পাত্র খুঁজে পেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে তাদের দু'জনকে শপথ করালে তারা এ সম্পর্কে কিছু জানে না বলে জবাব দিল। অপরদিকে এ পাত্রটি মক্কায় পাওয়া গেল এবং তারা বলল যে, আমরা তামীম এবং আদীর নিকট থেকে এ পাত্র খরিদ করেছি। অতঃপর সাহমীর পক্ষ থেকে দু'জন নিকটআত্মীয় দাঁড়িয়ে শপথ করে বলল যে, আমাদের শপথ ঐ দু'জনের শপথের চেয়ে উত্তম। এ পাত্রটি আমাদের লোকের। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। [বুখারীঃ ২৭৮০, আবু দাউদঃ ৩৬০৬, তিরমিযীঃ ৩০৬০]

৮। সন্দেহের সময় সাক্ষীদেরকে সালাতের পরে শপথ করানো এবং তাদের মধ্যে শপথ ভঙ্গের সম্ভাবনা প্রাপ্ত হলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করাটা হচ্ছে সঠিকভাবে সাক্ষ্য উপস্থাপনে লোকদের বাধ্য করার সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি।

হয় তারা আখেরাতের শাস্তির ভয়ে সঠিক সাক্ষ্য দিবে, না হয় দুনিয়ায় মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের পাল্টা শপথের মাধ্যমে তাদের সাক্ষ্যের অগ্রহণযোগ্যতা প্রকাশিত হওয়ার মত অপমানের ভয়ে তারা সঠিক সাক্ষ্য প্রদানে উদ্বুদ্ধ হবে। [মুয়াসসার]

আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং শুন; আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

সূরা মায়িদাঃ ১৫তম রুকু(১০৯-১১৫) আয়াত

১। আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-নিকাশের কাঠগড়ায় আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় রাসূলগণ কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে দুনিয়াবাসীকে তোমরা যে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলে তারা তার কী জবাব দিয়েছে?
তাঁরা বলবেন, আমাদের জীবনে আমরা যে সীমাবদ্ধ বাহ্যিক জবাবটুকু পেয়েছি বলে অনুভব করেছি কেবলমাত্র সেটুকুই আমরা জানি। আর আসলে আমাদের দাওয়াতের কোথায় কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং কোন আকৃতিতে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তার সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র আপনার ছাড়া আর কারোর পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর নয়।
২। আয়াতসমূহে ঈসা আলাইহিস সালামের ঐসব অনুগ্রহের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে, যা বিশেষভাবে ঈসা 'আলাইহিস সালামকে মু'জিযার আকার দেয়া হয়। এতে একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা করে বনী-ইসরাঈলের ঐ জাতিদ্বয়কে হুশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাকে অপমানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি আল্লাহ কিংবা 'আল্লাহর পুত্র' আখ্যা দেয়। [আইসারুত তাফসীর]
৩। حَوَارِيِّين বলা হয়, ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী শিষ্যগণকে; যাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাঁর সহচর ও সাহায্যকারী হিসাবে ছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ১২ জন বলা হয়ে থাকে।
আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমান ঢেলে দিয়েছিলেন, ফলে তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান এনেছিল। এখানে ওহী শব্দ ব্যবহার হলেও এর অর্থ হচ্ছে, মনে ইলহাম করা বা ঢেলে দেয়া। [মুয়াসসার]
৪। যখন হাওয়ারীরা ঈসা আ কাছে আকাশ থেকে পাত্রপূর্ণ খাদ্য অবতারণ দাবী করল, তখন তিনি উত্তরে বললেনঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। এতে বুঝা যায় যে, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের আব্দার করে আল্লাহকে পরীক্ষা করা কিংবা তার কাছে অলৌকিক বিষয় দাবী করা একান্ত অনুচিত। বরং ঈমানদার বান্দার পক্ষে আল্লাহর নির্ধারিত পথে চলার ব্যাপারে চেষ্টা চালানো। তবে হাওয়ারীগণ এ সন্দেহ থেকে মুক্ত থেকে বললেন যে, তাদের উদ্দেশ্য শুধু এ দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা, তাদের ও তাদের পরবর্তীদের জন্য এটি নিদর্শন হিসেবে কাজ করা এবং ঈমান বর্ধিত করা। [ইবন কাসীর
৫। আসমানী শরীয়তসমূহে ঈদের মর্যাদা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছু নয়। যার আসল উদ্দেশ্য এই হয় যে, সেদিন জাতির সকল মানুষ জামাআতবদ্ধভাবে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে, সকলে (একাকী) তাকবীর ও তাহমীদের আওয়াজ উঁচু করবে। এখানেও ঈসা (আঃ) যে দিনকে ঈদ বানানোর আশা পোষণ করেছেন, তাতে তাঁর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা ঐ ঈদে তোমার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা করব, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করব
৬।এক হাদীসে এসেছে, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সা এর কাছে এসে বললঃ আপনি আপনার রবের নিকট দোআ করুন যেন তিনি আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করে দেন, এরপর আমরা আপনার উপর ঈমান আনব। তখন রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ তোমরা কি তা করবে? জবাবে তারা বললঃ হ্যাঁ।

তখন রাসূল সা দোআ করলে জীবরাঈল এসে বললেনঃ আপনার প্রভূ আপনাকে সালাম দিচ্ছেন এবং বলছেনঃ যদি আপনি চান তবে তাদের জন্য তিনি সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করবেন। কিন্তু এরপর তাদের মধ্যে যদি কেউ কুফর করে তাহলে আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি পৃথিবীর কাউকে কোনদিন দিব না, আর যদি আপনি চান তবে তাদের জন্য আমি তাওবাহ এবং রহমতের দরজা খুলে দেব। রাসূলুল্লাহ সা তখন বললেনঃ বরং আমি চাই তাওবাহ এবং রহমতের দরজা। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৪২, ২১৬৭, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৫৩]

সূরা মায়িদাঃ ১৬তম রুকু(১১৬-১২০) আয়াত

১। মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন ইসা আ কে প্রশ্ন করবেন, আপনি কি লোকদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে আমার জননীকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ কর? ঈসা (আঃ) কত স্পষ্ট শব্দে নিজের জন্য গায়বী খবর (অদৃশ্যের জ্ঞান) জানার কথা খন্ডন করছেন। আপনি আমাকে যে আদেশ করেছেন তা ছাড়া তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি, তা এই যেঃ তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কাজকর্মের সাক্ষী, কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সব বিষয়ে সাক্ষী।

আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তে আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ নিশ্চয় কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে এবং কিছুসংখ্যক লোককে পাকড়াও করে বাম দিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবঃ আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবেঃ আপনি জানেন না আপনার পরে তারা কি সব নতুন পদ্ধতির প্রচলন করেছে। তখন আমি বলবঃ যেমন নেক বান্দা বলেছেন, "এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কাজকর্মের সাক্ষী, কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সব বিষয়ে সাক্ষী। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [বুখারীঃ ৪৬২৬]

মহানবী সা একবার এ আয়াতখানি পাঠ করে হাত উঠালেন এবং দোআ করে বললেনঃ হে আল্লাহ! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত! এবং কাঁদতে থাকলেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা জিবরীলকে বললেনঃ মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর - যদিও তিনি সর্ববিষয়ে ভাল জানেন- কেন তিনি কাঁদছেন? জিবরীল তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন আর রাসূলও তার উত্তর করলেন। তখন আল্লাহ আবার বললেনঃ হে জিবরীল, মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাকে বল, আমরা আপনার উম্মাতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব; অসন্তুষ্ট করব না। [মুসলিমঃ ২০২]

নবী করীম (সাঃ) এক রাতে এই আয়াত পাঠ করতে করতে তাঁর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তিনি এই আয়াত বার বার পড়তেই থাকেন। এমন কি পরিশেষে ফজর হয়ে যায়! (আহমাদ ৫/১৪৯)

২। আল্লাহ বলবেন, এ সে দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাদের সত্যের জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট; এটা মহাসফলতা।

ইবনে আববাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'যেদিন তওহীদবাদিগণকে তাঁদের তওহীদ উপকৃত করবে।' অর্থাৎ, মুশরিকদের ক্ষমা ও পরিত্রাণের কোন রাস্তাই থাকবে না।

জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ বড় নেয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট; এখন থেকে কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। [বুখারী: ৬৫৪৯; মুসলিম: ১৮৩]

৩। আসমান ও যমীন এবং এদুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

Sisters' Forum In Islam.com

সূরা আন'আমঃ মোট রুকুঃ ২০ মোট আয়াতঃ ১৬৫

সূরার ফযিলতঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ সূরা আল-আন'আমের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকখানি আয়াত বাদে গোটা সূরাটিই একযোগে মক্কায় নাযিল হয়েছে। জাবের, ইবন আব্বাস, আনাস ও ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সূরা আল-আন'আম নাযিল হচ্ছিল, তখন এত ফিরিশতা তার সাথে অবতরণ করেছিলেন যে, তাতে আকাশের প্রান্তদেশ ছেয়ে যায়। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৭০; ২৪৩১] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সূরা আল-আন'আম কুরআনের উৎকৃষ্ট অংশের অন্তর্গত। [সুনান দারমী ২/৫৪৫; ৩৪০১]
ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে এ সম্পূর্ণ সূরাটি একই সাথে মক্কায় নাযিল হয়েছিল। হযরত মু'আয ইবনে জাবালের চাচাত বোন হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনীর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হতে থাকে। তখন আমি তাঁর উটনীর লাগাম ধরে ছিলাম। বোঝার ভারে উটনীর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যেন মনে হচ্ছিল এই বুঝি তার হাড়গোড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।" হাদীসে একথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, যে রাতে এ সূরাটি নাযিল হয় সে রাতেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে লিপিবদ্ধও করান।
এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে সুস্পষ্টভাবে মনে হয়, এ সূরাটি মক্কী যুগের শেষের দিকে নাযিল হয়ে থাকবে।

নামকরণ

এ সূরারা ১৬ ও ১৭ রুকূতে কোন কোন আন'আমের (গৃহপালিত পশু) হারাম হওয়া এবং কোন কোনটির হালাল হওয়া সম্পর্কিত আরববাসিদের কাল্পনিক ও কুসংস্কারমূলক ধারণা বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ সূরারই ১৩৬, ১৩৯ ও ১৪২ নং আয়াতসমূহে উল্লেখিত "আল-আন'আম" শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।
আল-আনআম শব্দের অর্থঃ গবাদি পশু।

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য

সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর আমরা সহজেই এর প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। আল্লাহর রসূল যখন মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করেছিলেন তারপর থেকে বারোটি বছর অতীত হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশদের প্রতিবন্ধকতা, জুলুম ও নির্যাতন চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ইসলাম গ্রহণকারীদের একটি অংশ তাদের অত্যাচার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল। তারা হাবশায় (ইথিওপিয়া) অবস্থান করছিল।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য-সমর্থন করার জন্য আবু তালিব বা হযরত খাদীজা (রা.) কেউই বেঁচে ছিলেন না। ফলে সব রকমের পার্থিব সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠোর প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রভাবে মক্কায় ও চারপাশের গোত্রীয় উপজাতিদের মধ্য থেকে সৎ লোকেরা একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করে চলছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতি ইসলামের অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের গোঁয়ার্তুমি অব্যাহত রেখেছিল। কোথাও কোন ব্যক্তি ইসলামের দিকে সামান্যতম ঝোঁক প্রকাশ করলেও তার পেছনে ধাওয়া করা হতো। তাকে তিরস্কার, গালিগালাজ করা হতো। শারীরিক দুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক, সামাজিক নিপীড়নে তাকে জর্জরিত করা হতো। এ অন্ধকার বিভীষিকাময় পরিবেশে একমাত্র ইয়াসরেবের দিক থেকে একটি হালকা আশার আলো দেখা দিয়েছিল। সেখানকার আওস ও খাযরাজ গোত্রের প্রভাবশালী লোকেরা এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাই'আত করে গিয়েছিলেন। সেখানে কোন প্রকার আভ্যন্তরীণ বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়েই ইসলাম প্রসার লাভ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এ ছোট্ট একটি প্রারম্ভিক বিন্দুর মধ্যে ভবিষ্যতের যে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তা কোন স্থুলদর্শীর দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হতো, ইসলাম একটি দুর্বল আন্দোলন। এর পেছনে কোন বৈষয়িক ও বস্তুগত শক্তি নেই। এর আহবায়কের পেছনে তাঁর পরিবারের ও বংশের দুর্বল ও ক্ষীণ সাহায্য-সমর্থন ছাড়া আর কিছুই নেই। মুষ্টিমেয় অসহায় ও বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেন মনে হয় নিজেদের জাতির বিশ্বাস, মত ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা সমাজ থেকে এমনভাবে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেমন গাছের মরা পাতা মাটির ওপর ঝরে পড়ে।

সূরা আন’আমঃ মোট রুকুঃ ২০ মোট আয়াতঃ ১৬৫

আলোচ্য বিষয়

মক্কী সূরাগুলোর ব্যাপারে আমাদের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূরার বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনা পদ্ধতি এবং প্রত্যেক সূরার নাযিলের পটভূমি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইশারা-ইঙ্গিতের আকারে যে আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে তার ওপরই নির্ভর করতে হয়।

এহেন পটভূমিতে এ ভাষণটি নাযিল হয়। এ হিসেবে এখানে আলোচ্য বিষয়গুলোকে প্রধান সাতটি শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারেঃ

একঃ শিরককে খণ্ডন করা ও তাওহীদ বিশ্বাসের দিকে আহবান জানানো।

দুইঃ আখেরাত বিশ্বাসের প্রচার এবং এ দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু, এ ভুল চিন্তার অপনোদন।

তিনঃ জাহেলীয়াতের যে সমস্ত ভ্রান্ত কাল্পনিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারে লোকেরা ডুবে ছিল তার প্রতিবাদ করা।

চারঃ যেসব বড় বড় নৈতিক বিধানের ভিত্তিতে ইসলাম তার সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে চায় সেগুলো শিক্ষা দেয়া।

পাঁচঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত লোকদের বিভিন্ন আপত্তি ও প্রশ্নের জবাব।

ছয়ঃ সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সাধনা সত্ত্বেও দাওয়াত ফলপ্রসূ না হবার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে অস্থিরতা ও হতাশাজনক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল সে জন্য তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া।

সাতঃ অস্বীকারকারী ও বিরোধী পক্ষকে তাদের গাফলতি, বিহ্বলতা ও অজ্ঞানতা প্রসূত আত্মহত্যার কারণে উপদেশ দেয়া, ভয় দেখানো ও সতর্ক করা।

কিন্তু এখানে যে ভাষণ দেয়া হয়েছে তাতে এক একটি শিরোনামের আওতায় আলাদা আলাদাভাবে একই জায়গায় পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচনা করার রীতি অনুসৃত হয়নি। বরং ভাষণ এগিয়ে চলেছে নদীর স্রোতের মতো মুক্ত অবাধ বেগে আর তার মাঝখানে এ শিরোনামগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ভেসে উঠেছে এবং প্রতিবারেই নতুন নতুন ভংগীতে এর ওপর আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের এ পদ্ধতি অনুসরণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা ইলামী দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে একে চারটি প্রধান প্রধান ও উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে বিভক্ত দেখতে পাইঃ

প্রথম পর্যায়ঃ নবুওয়াত প্রাপ্তির সূচনা থেকে শুরু করে নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এ সময় গোপনে দাওয়াত দেবার কাজ চলে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। মক্কার সাধারণ লোকেরা এ সম্পর্কে তখনো কিছুই জানতো না।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণার পর থেকে জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন ও উৎপীড়নের সূচনাকাল পর্যন্ত প্রায় দু’বছর। এ সময় প্রথমে বিরোধিতা শুরু হয়। তারপর তা প্রতিরোধের রূপ নেয়। এরপর ঠাট্টা, বিদ্রুপ, উপহাস, দোষারোপ, গালিগালাজ, মিথ্যা প্রচারণা এবং জোটবদ্ধভাবে বিরোধিতা করার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। যারা তুলনামূলকভাবে বেশী গরীব, দুর্বল ও আত্মীয় বান্ধবহীন ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে তারাই হয় সর্বাধিক নির্যাতনের শিকার।

তৃতীয় পর্যায়ঃ চরম উৎপীড়নের সূচনা অর্থাৎ নবুওয়াতের ৫ম বছর থেকে নিয়ে আবু তালিব ও হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকাল তথা ১০ম বছর পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়-কাল পর্যন্ত এ পর্যায়টি বিস্তৃত। এ সময়ে বিরোধীতা চরম আকার ধারণ করতে থাকে। মক্কার কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক মুসলমান আবিসিনিয়া হিজরত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট করা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমর্থক ও সংগী-সাথীদের নিয়ে আবু তালিব গিরিবর্তে অবরুদ্ধ হন।

চতুর্থ পর্যায়ঃ নবুওয়াতের দশম বছর থেকে ত্রয়োদশ বছর পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের জন্য সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক সময়। তাঁর জন্য মক্কায় জীবন যাপন করা কঠিন করে দেয়া হয়েছিল। তায়েফে গেলেন। সেখানেও আশ্রয় পেলেন না। হজ্জের সময়ে আরবের প্রতিটি গোত্রকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ ও তাঁকে সাহায্য করার আবেদন জানালেন। কিন্তু কোথাও সাড়া পেলেন না। এদিকে মক্কাবাসীরা তাঁকে হত্যা করার, বন্দী করার বা নগর থেকে বিতাড়িত করার জন্য সলা-পরামর্শ করেই চলছিল। অবশেষে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আনসারদের হৃদয় দুয়ার ইসলামের জন্য খুলে গেলো। তাদের আহবানে তিনি মদীনায় হিজরত করলেন।

এ সকল পর্যায়ে বিভিন্ন সময় কুরআন মজীদের যে সমস্ত আয়াত নাযিল হয় সেগুলোর প্রত্যেকটি তাদের বিষয়বস্তু ও বর্ণনা রীতির দিক দিয়ে পরস্পর থেকে বিভিন্ন। এক পর্যায়ের আয়াতের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী অন্য পর্যায়ের আয়াতের থেকে ভিন্নধর্মী। এদের বহু স্থানে এমন সব ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা থেকে তাদের পটভূমির অবস্থা ও ঘটনাবলীর ওপর সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে নাযিলকৃত বাণীর মধ্যে বিপুলভাবে লক্ষণীয়

সূরা আন'আমঃ ১ম রুকু(১-১০)আয়াতঃ ১ম স্লাইড

১।এ সূরাটিকে (الْحَمْدُ لِلَّهِ)বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। এতে খবর দেয়া হয়েছে যে, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহর জন্য।
'নূর' (জ্যোতি) একবচন এবং 'যুলুমাত' (অন্ধকার) বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।
আলোর মোকাবিলায় 'অন্ধকার' শব্দটিকে বহুবচনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। কারণ, অন্ধকার বলা হয় আলোবিহীনতাকে আর আলোবিহীনতার রয়েছে অসংখ্যা পর্যায়। তাই আলো এক বা একক এবং অন্ধকার একাধিক, বহু।
কাতাদা বলেন, এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানকে যমীনের পূর্বে, অন্ধকারকে আলোর পূর্বে এবং জান্নাতকে জাহান্নামের পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। [তাবারী]
যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি যারা সৃষ্টি করতে পারে না তাদের মত? সুতরাং কিভাবে ইবাদাতে ও সম্মানে তাঁর সমকক্ষ কাউকে দাড় করানো যায়?
২।প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগত অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তম বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎবিশেষ।
প্রথম 'আজাল' (নির্দিষ্টকাল) বলতে জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের বয়সকে বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় 'আজাল মুসাম্মা' (নির্ধারিত সময়সীমা) বলতে মানুষের মৃত্যু থেকে নিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার সম্পূর্ণ বয়সকে বুঝানো হয়েছে। যার পর সে সম্পূর্ণ রূপে বিনাশ হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় আর এক দুনিয়া অর্থাৎ, আখেরাতের জীবন শুরু হয়ে যাবে। মানুষকে শৈথিল থেকে জাগ্রত করার জন্য বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ুষ্কাল রয়েছে, যার পর তার মৃত্যু অবধারিত। প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশ-পাশে প্রত্যক্ষ করে। এটা যেহেতু সত্য, সেহেতু এরপরও আরেকটি সময় তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। যার ঘোষণা আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে না। [ইবন কাসীর, সা'দী, আল-মুনীর, ফাতহুল কাদীর, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]
আয়াতের শেষভাগে কিয়ামতের উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে (ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ)অর্থাৎ এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্বেও তোমরা কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর! এটা অনুচিত।
৩।মহান আল্লাহ তো আরশে সমাসীন; যেভাবে তাঁর সত্তার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁর জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান। অর্থাৎ, কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়।
৪। আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্যবিরোধী জেদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাদের কাছে আল্লাহর নিদর্শনাবলী থাকার পাশাপাশি নবী-রাসূলগণ তাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে এসেছেন এবং তা তাদের কাছে স্পষ্টও হয়েছে। তা সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের হেদায়াতের জন্য যে কোন নিদর্শন প্রেরণ করা হলে, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়- এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না। [মুয়াসসার]

সূরা আন’আমঃ ১ম রুকু(১-১০)আয়াতঃ ২য় স্লাইড

৫।এই বিমুখতা এবং মিথ্যা ভাবার শাস্তি তারা পাবে। তখন তাদের মধ্যে এই অনুভূতির সৃষ্টি হবে যে, হায়! এই সত্য কিতাবকে মিথ্যাজ্ঞান এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ যদি না করতাম!

আল্লাহ আরও বলেন, “আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না। কেন নয়? তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই এটা জানে না-- তিনি পুনরুথিত করবেন যে বিষয়ে তাদের মতানৈক্য ছিল তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য এবং যাতে কাফিররা জানতে পারে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী। [সূরা আন-নাহ্‌ল: ৩৮, ৩৯]

৬। আয়াতে কাফেরদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেয়ার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, “আমরা তাদের পূর্বে অনেক ‘করণ’ (প্রজন্ম)কে ধ্বংস করে দিয়েছি।” [সা’দী] قَرْن শব্দের অর্থ সমসাময়িক লোকসমাজ এবং সুদীর্ঘ কাল। দশ বছর থেকে একশ’ বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। [বাগভী, কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে বুছরকে বলেছিলেনঃ ‘সে এক করণ পর্যন্ত জীবিত থাকবে। পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ’ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন’। [মুসনাদে আহমাদ ৪/১৮৯]

আদ ও সামূদ গোত্রের মত শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও ইয়েমেনবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা নয়। এসব অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা’আলার শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত, অসাধারণ জাকজমক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের পলকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়ে যায় নি, বরং তাদেরকে ধ্বংস করার সাথে সাথে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। সুতরাং মক্কাবাসীদের উচিত ভয় করা। [কুরতুবী, ইবন কাসীর]

৭। আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের কাছে যদি কাগজে লিখা কিতাবও নাযিল করা হয় তবুও তারা ঈমান আনবে না।আল্লাহ জানিয়েছেন-

কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনো ঈমান আনব না যতক্ষন তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল না করবে যা আমরা পাঠ করব। [সূরা আল-ইসরা: ৯৩]

আল্লাহ বলেন, যদি আমরা তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেই তারপর তারা তাতে আরোহন করতে থাকে, তবুও তারা বলবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়। [সূরা আল-হিজরঃ ১৫]

৮। কাফেররা স্পষ্টই জানত যে, রাসূলের কাছে ফিরিশতাই ওহী নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের কাছে তা জানাতেন।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “আরও তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে কোন ফিরিশতা কেন নাযিল করা হল না, যে তার সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে?” [সূরা আল-ফুরকান: ৭]

আল্লাহ বলেন, “আমরা ফিরিশতাদেরকে যথার্থ কারণ ছাড়া প্রেরণ করি না; ফিরিশতারা উপস্থিত হলে তখন তারা আর অবকাশ পাবে না।” [সূরা আল-হিজর: ৮]

আরও বলেন, যেদিন তারা ফিরিশতাদেরকে দেখতে পাবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, রক্ষা কর, রক্ষা কর। [সূরা আল-ফুরকান: ২২] আদওয়াউল বায়ান]

যদি আমি ফিরিশতাকেই রসূল বানিয়ে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতাম, তাহলে এ কথা পরিষ্কার যে, সে তো ফিরিশতার আকৃতিতে আসতে পারত না, কারণ এতে (ফিরিশতার আকৃতি-প্রকৃতিতে এলে) মানুষ তাকে ভয় পেত এবং তার নিকট হওয়ার পরিবর্তে তার থেকে আরো দূর হওয়ার চেষ্টা করত। তাই তাকে মানুষের রূপেই পাঠানো অপরিহার্য হত।

৯।আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্তনার জন্য বলা হয়েছেঃ স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব নবীকে এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতি ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তারা সাহস হারাননি। পরিণামে বিদ্রুপকারী জাতিকে সে আযাবই পাকড়াও করেছে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত

সূরা আন’আমঃ ২য় রুকু(১১-২০)আয়াতঃ ১ম স্লাইড

১। বলুন, তোমরা যমীনে পরিভ্রমণ কর, তারপর দেখ, যারা মিথ্যারোপ করেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছিল।

২।আয়াতে কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে? অতঃপর আল্লাহ নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাচনিক উত্তর দিয়েছেনঃ সবার মালিক আল্লাহ।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ‘‘যখন মহান আল্লাহ সৃষ্টদের সৃষ্টি করলেন, তখন আরশে লিখে দিলেন, ‘‘ إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْআমার দয়া আমার ক্রোধের উপরে বিজয়ী।’’ (বুখারীঃ তাওহীদ অধ্যায়, মুসলিমঃ তাওবা অধ্যায়)

তবে তাঁর রহমতের এই ব্যাপকতা দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ।প্রতিফল ও প্রতিদানের স্থান আখেরাতে আল্লাহর সুবিচারক হওয়ার গুণের পূর্ণ বিকাশ ঘটবে।

দয়া ও রহমত কিয়ামতের দিন কেবল ঈমানদারদের জন্য হবে। আর কাফেরদের প্রতি প্রতিপালক চরম ক্রোধান্বিত হবেন।

‘আমার দয়া প্রতিটি জিনিসের উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।’’ (সূরা আ’রাফ ১৫৬)

৩। আর রাত ও দিনে যা কিছু স্থিত হয়, তা তারই(১) এবং তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন।

৪। وليঅর্থ অভিভাবক, বন্ধু। এখানে উদ্দেশ্যঃ মাবূদ, উপাস্য। নচেৎ কোন সৃষ্টির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা তো বৈধ।আল্লাহ তা’আলা সেটা বলেছেন, আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে। আমি তাদের কাছ থেকে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে, নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই তো রিযকদাতা, প্রবল শক্তিধর, পরাক্রমশালী। [সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬-৫৮

যে উম্মতের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি সে উম্মতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রথম ব্যক্তি হই।আল্লাহ তা’আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন, ‘‘স্মরণ করুন, যখন তার রব তাকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পণ করুন, তিনি বলেছিলেন, আমি সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।’’ [সূরা আল-বাকারাহ: ১৩১]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি বলে দিন, মনে কর, যদি আমিও স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারো কিয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করলে যখন নবীগণের যিনি নেতা, তাকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

সূরা আন’আমঃ ২য় রুকু(১১-২০)আয়াতঃ ২য় স্লাইড

৬। হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে। কাতাদা বলেন, এখানে যা সরানোর কথা বলা হচ্ছে, তা হচ্ছে শাস্তি। কারো উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহর অশেষ করুণা হয়েছে।

সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে সফল হবে।’’ (সূরা আল-ইমরান ১৮৫) কারণ, সফলতা হলো অকল্যাণ থেকে বেঁচে যাওয়া এবং কল্যাণ অর্জন করার নাম।

৭। আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি লাভক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা’আলা। সত্যিকারভাবে কোন ব্যক্তি কারো সামান্য উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। আল্লাহ যদি কারও লাভ করতে চান তবে তা বন্ধ করার ক্ষমতা কারও নেই। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “আর আল্লাহ যদি আপনার মংগল চান তবে তার অনুগ্রহ প্রতিহত করার কেউ নেই। তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার কাছে সেটা পৌছান।’’ [সূরা ইউনুস: ১০৭]

একটি হাদীসে এই বিষয়টাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে

اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

“হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর, তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর তুমি যা রোধ কর, তা কেউ দিতেও পারে না। আর ধনীদের ধন তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন উপকারে আসবে না।’’ (বুখারীঃ ই’তিসাম অধ্যায়, মুসলিম, সালাত ও মাসাজিদ অধ্যায়) নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই দু’আটি পাঠ করতেন।

৮। তিনিই আপন বান্দাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী, আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।

৯। বলুন, ’আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যদাতা। আর এ কুরআন আমার নিকট ওহী করা হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট পৌছবে তাদেরকে এ দ্বারা সতর্ক করতে পারি

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্যই ভীতিপ্রদর্শনকারী যার কাছে এ কুরআনের আহবান পৌছেছে, সে যে-ই হোক না কেন। সুতরাং যার কাছেই এ আহবান পৌছবে সে তাতে ঈমান আনতে বাধ্য। যদি তা না করে তবে সে হবে জাহান্নামী। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত যে সর্বকাল ও সর্বজনব্যাপী তার প্রমাণ কুরআনের অন্য আয়াতেও এসেছে, “বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রাসূল।’’ [সূরা আল-আরাফ: ১৫৮]

“আর আমরা তো আপনাকে কেবল সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।’’ [সূরা সাবা: ২৮]

১০। আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ চিনে যেরূপ চিনে তাদের সন্তানদেরকে। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারাই ঈমান আনবে না।

يَعْرِفُوْنَهُতে সর্বনাম (তাকে)এর লক্ষ্যস্থল হল রসূল (সাঃ)। অর্থাৎ, কিতাবধারীরা রসূল (সাঃ)-কে ঐভাবেই চিনত, যেভাবে তারা তাদের ছেলেদেরকে চিনত। এখন তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে না, তারা বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

সূরা আন’আমঃ ৩য় রুকু(২১-৩০)আয়াতঃ ১ম স্লাইড

১। আল্লাহর ব্যপারে যে মিথ্যা দোষারোপ তারা করে সেতা হলো-প্রভুত্বের ব্যাপারে আরো অনেক সত্তা আল্লাহর সাথে শরীক৷ তাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার গুণাবলী এবং তারা মানুষের সামনে তাদের বন্দেগী লাভ করার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করার যোগ্যতা রাখে৷
আল্লাহর নিদর্শনাবলী বলতে বুঝানো হয়েছে যেগুলো মানুষের নিজের সত্তার মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে, নবী-রসূলগনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে যেগুলোর প্রকাশ ঘটেছে এবং যেগুলো আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে পেশ করা হয়েছে৷ এ সমস্ত নিদর্শন একটি মাত্র সত্যের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে৷ সে সত্যটি হচ্ছে, এ সৃষ্টিজগতের বুকে যা কিছু অস্তিত্বমান তার মধ্যে বিধাতা ও মনিব মাত্র একজনই এবং বাকি সবাই প্রজা ও বান্দা৷ যারা এইগুলো মিথযা বলছে তারাই যালিম।
২। ঐ দিনটিও স্মরণ যোগ্য, যেদিন আল্লাহ সবাইকে অর্থাৎ মুশরিক ও তাদের তৈরী করা উপাস্যসমূহকে একত্রিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় স্বীয় অভাব পূরণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায়? তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন?
৩। فتنة এর একটি অর্থ ‘হুজ্জত’ এবং আর একটি অর্থ ‘ওজুহাত’ করা হয়েছে। পরিশেষে এরা হুজ্জত অথবা ওজুহাত পেশ করে নিষ্কৃতি লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে বলবে যে, ‘আমরা তো মুশরিকই ছিলাম না।’
৪।যে বাতিল উপাস্যগুলোকে এরা তাদের সমর্থক, সাহায্যকারী এবং সুপারিশকারী মনে করত, তারাও অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং এই শরীকদের প্রকৃত অবস্থা সেখানে স্পষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু আখেরাতে এই অবস্থাকে দূরীভূত করার কোন উপায় থাকবে না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ যে কাজের দরুন মানুষ জাহান্নামে যাবে, তা কি? তিনি বললেনঃ সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা। [মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭৬] অনুরূপভাবে, মে’রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্যধারা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনি জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ‘এ ব্যক্তি কে? জিবরীল বললেনঃ ‘এ হলো মিথ্যাবাদী’। [বুখারী ১৩৮৬; মুসনাদে আহমাদ: ৫/১৪]
৫। এই মুশরিকরা রাসূল সা এর কাছে এসে কুরআন তো শোনে, কিন্তু হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্য না থাকার কারণে তা তাদের জন্য ফলপ্রসূ হয় না।এখানে কুরাইশদের কথা বলা হচ্ছে, তারাই কান পেতে শুনত। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদাহ বলেন, মুশরিকরা তাদের কান দিয়ে শুনত কিন্তু সেটা তারা বুঝতো না।

সূরা আন’আমঃ ৩য় রুকু(২১-৩০)আয়াতঃ ২য় স্লাইড

৬। ওরা সাধারণ লোকেদেরকেও নবী করীম (সাঃ) থেকে এবং কুরআন থেকে বাধা দেয়, যাতে তারা ঈমান না আনে এবং নিজেরাও দূরে দূরে থাকে।আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী সা-এর চাচা আবু তালেব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তিনি তাকে কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কুরআনে বিশ্বাস করতেন না। এমতাবস্থায় عنه শব্দের সর্বনামটির অর্থ কুরআনের পরিবর্তে মুহাম্মদ সা হবেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩১৫]

৭।এ আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, আখেরাতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস, হায়! যদি আমাদেরকে ফেরত পাঠানো হত, আর আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ না করতাম এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা দেখলাম ও শুনলাম। এখন আমাদেরকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি।’’ (সূরা সাজদাহ ১২)

৮। তারা ওয়াদা করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করবো না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না; তারা দুনিয়াতে পৌছে আবারো মিথ্যারোপ করবে।সাময়িক বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্যে বলছে- অন্তরে এখনো তাদের সদিচ্ছা নেই। [ইবন কাসীর]

৯। যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে পৌছে একথাই বলবে যে, আমরা এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন মানি না; এ জীবনই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না। [ইবন কাসীর] মোটকথাঃ কাফের ও পাপীরা হাশরের ময়দানে প্রাণ রক্ষার্থে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা ধরণের কথাবার্তা বলবে।

১০। স্বচক্ষে দর্শন করার পর তো তারা স্বীকার করবেই যে, আখেরাতের জীবন বাস্তব ও সত্য। তবে সেখানে এই স্বীকারোক্তির কোন লাভ হবে না এবং মহান আল্লাহ বলবেন, "এখন তোমরা তোমাদের কুফরীর কারণে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।"

সূরা আন’আমঃ ৪র্থ রুকু(৩১-৪১)আয়াতঃ ১ম স্লাইড

১। আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারকে যারা মিথ্যা মনে করে, তারা যেভাবে ক্ষতির ও অসফলতার শিকার হবে, নিজেদের উদাসীনতার জন্য যেভাবে তারা অনুতপ্ত হবে এবং মন্দ আমলগুলোর বোঝা যেভাবে তারা বহন করবে, তারই চিত্র এই আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে

কিয়ামত হঠাৎ করেই হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত এমনভাবে সংঘটিত হবে যে, দু’জন লোক কোন কাপড় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রসারিত করেছে, সেটাকে তারা আবার মোড়ানোর সময় পাবে না। কিয়ামত এমনভাবে হবে যে, একজন তার জলাধার ঠিক করছে কিন্তু সেটা থেকে পানি পান করার সময় পাবে না। কিয়ামত এমনভাবে হবে যে, তোমাদের কেউ তার গ্রাসটি মুখের দিকে নেওয়ার জন্য উঠিয়েছে কিন্তু সে সেটা খেতে সময় পাবে না। [বুখারী: ৬৫০৬; মুসলিম: ২৯৫৪]

২। দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই উত্তম; অতএব, তোমরা কি অনুধাবন কর না? আখেরাতের যথার্থ ও চিরন্তন জীবনের তুলনায় দুনিয়ার এ জীবনটি ঠিক তেমনি যেমন কোন ব্যক্তি কিছুক্ষণ খেলাধূলা করে চিত্তবিনোদন করে তারপর তার আসল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাবারে মনোনিবেশ করে৷ তাছাড়া একে খেলাধূলার সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, এখানে প্রকৃত সত্য গোপন থাকার ফলে যারা ভেতরে দৃষ্টি না দিয়ে শুধুমাত্র বাইরেরটুকু দেখতে অভ্যস্ত তাদের জন্য বিভ্রান্তির শিকার হবার বহুতর কারণ বিদ্যামান৷ এসব বিভ্রান্তির শিকার হয়ে মানুষ প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে এমন সব অদ্ভুত ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে যার ফলশ্রুতিতে তাদের জবীন নিছক একটি খেলা ও তামাসার বস্তুতে পরিণত হয়৷

৩। নবী করীম (সাঃ)-কে কাফেরদের মিথ্যা ভাবার কারণে যে দুঃখ-কষ্ট তাঁর হত, তা দূরীকরণের এবং তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে যে, এই মিথ্যা মনে করা তোমাকে নয় (তোমাকে তো তারা সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করে), বরং প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে এবং এটা একটি মস্ত বড় যুলুমের কাজ তারা করছে। তিরমিযী ইত্যাদির একটি বর্ণনায়, আবূ জাহল একদা রসূল (সাঃ)-কে বলল, ‘হে মুহাম্মাদ, আমরা তোমাকে নয়, বরং তুমি যা নিয়ে এসেছ সেটাকে মিথ্যা মনে করি।’ তার উত্তরে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়

৪। নবী করীম (সাঃ)-কে অতিরিক্ত সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর পয়গম্বরকে কাফেরদের অস্বীকার করার ঘটনা এটা প্রথম নয়, বরং পূর্বেও অনেক রসূল এসেছিলেন যাদেরকে মিথ্যা মনে করা হয়েছে। অতএব তাদের অনুসরণ করে তুমিও ধৈর্য ও সাহসিকতা অবলম্বন কর, যেভাবে তারা তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান ও কষ্টদানের সময় ধৈর্য ধারণ ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিল। যাতে তোমার কাছেও আমার সাহায্য-সহযোগিতা ঐভাবেই আসে, যেভাবে পূর্বের রসূলদের কাছে আমার সাহায্য-সহযোগিতা এসেছে।
{“ {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا}অবশ্যই আমি আমার রসূলদের এবং ঈমানদারদের সাহায্য করব।” (সূরা মুমিন ৫১)
‘আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব।” (সূরা মুজাদালাহ ২১,

৫। তবুও যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে তোমার মধ্যে কিছু শক্তি থাকলে তুমি ভূগর্ভে কোন সুড়ংগ খুঁজে নাও অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগাও এবং তাদের কাছে কোন নিদর্শন আনার চেষ্টা করো৷ আল্লাহ চাইলে এদের সবাইকে হেদায়াতের ওপর একত্র করতে পারতেন৷ কাজেই মূর্খদের অন্তরভুক্ত হয়ো না৷

Sisters’Forum In Islam.com

সূরা আন’আমঃ ৪র্থ রুকু(৩১-৪১)আয়াত

৬। এই কাফেরদের অবস্থা হল মৃতদের মত। যেভাবে মৃতরা শোনা ও অনুধাবন করার শক্তি থেকে বঞ্চিত, অনুরূপ এরা যেহেতু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা সত্যকে বুঝতে চেষ্টা করে না, তাই এরাও মৃত। “যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমরা পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে।” [সূরা আল-আনআমঃ ১২২]

৭। মুশরিকরা এমন কোন অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল, যা দেখার পর তারা ঈমান আনবে বলে ওয়াদা করছে। আল্লাহ্ তা’আলা এ আয়াতে এটাই ঘোষণা করছেন যে, তাদের চাহিদা মোতাবেক নিদর্শন দেখানো আল্লাহর পক্ষে অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু তারা প্রকৃত অবস্থা জানে না।

যদি তাদের কথামত নিদর্শন দেয়ার পর তারা ঈমান না আনে, তবে আল্লাহর শাস্তির পথে আর কোন বাধা থাকবে না। যেমনটি সালিহ আলাইহিস সালামের জাতির বেলায় ঘটেছিল। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন, “আর পূর্ববর্তিগণের নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাদেরকে নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত রাখে।

৮। আর যমীনে বিচরণশীল প্রতিটি জীব বা দু’ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি উম্মত। এ কিতাবে আমরা কোন কিছুই বাদ দেইনি; তারপর তাদেরকে তাদের রব-এর দিকে একত্র করা হবে।

আয়াত থেকে জানা যায় কেয়ামতের দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও জীবিত করা হবে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন তোমরা সব হক আদায় করবে, এমনকি (আল্লাহ্ তা’আলা এমন সুবিচার করবেন যে,) কোন শিং বিশিষ্ট জন্তু কোন শিংবিহীন জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এ দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেয়া হবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৬২] এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধও নেয়া হবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৬২] ‘কিতাব’ বলতে ‘লাওহে মাহফূয’। অর্থাৎ, তাতে প্রতিটি জিনিসই লিপিবদ্ধ আছে। অথবা ‘কিতাব’ অর্থ কুরআন।

৯। আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞানকারীরা যেহেতু নিজেদের কান দিয়ে সত্য কথা শুনে না এবং নিজেদের জবান দিয়ে সত্য কথা বলে না, সেহেতু তারা হল ঐ রকমই, যে রকম হল বোবা ও বধির। এ ছাড়াও এরা কুফরী ও ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত।

১০। যদি আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হয় বা তোমাদের কাছে কিয়ামত উপস্থিত হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

তাওহীদ হল মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক আহবান। যখন সে কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তখন এ সব ভুলে যায়। তখন তার মূল প্রকৃতি এ সবের উপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং অন্য এখতিয়ার ছাড়াই সেই সত্তাকেই ডাকে, যাঁকে ডাকা উচিত।

সূরা আন’আমঃ ৫ম রুকু(৪২-৫০)আয়াত

১। আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা’আলা পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী এবং তাদের উপর প্রয়োগকৃত বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেছি। দু’ভাবে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে কি না।

২। জাতি যখন চারিত্রিক অবনতি এবং অনুচিত কর্ম-কান্ডের শিকার হয়ে নিজেদের অন্তঃকরণে জং লাগিয়ে নেয়, তখন আল্লাহর আযাবও তাদেরকে উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগাতে এবং তাদের মনে পরিবর্তন আনতে অসফল হয়। তাদের হাত ক্ষমা চাওয়ার জন্য আল্লাহর সামনে ওঠে না, তাদের অন্তর তাঁর কাছে বিনয়ী হয় না এবং সংশোধন হওয়ার প্রতি তাদের কোন আগ্রহও জাগে না। বরং নিজেদের মন্দ আমলগুলোর উপর অপব্যাখ্যা ও অজুহাতের সুন্দর চাদর চাপিয়ে নিজেদের মনকে সন্তুষ্ট করে নেয়। এই আয়াতে এমন জাতিরই সেই কর্ম-কান্ডসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোকে শয়তান তাদের জন্য সুন্দর আকারে পেশ করে।

৩। আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়ার নেয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেয়া হয়। এতে সাধারণ মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে আছে এবং সফল জীবন যাপন করছে। অনেক সময় আযাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহেরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা’আলা দুনিয়ার ধন-দৌলত প্রদান করছেন, অথচ সে গোনাহ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৪৫]

৪। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ‘‘যখন তোমরা দেখবে যে, মহান আল্লাহ অবাধ্যতা সত্ত্বেও কাউকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী পার্থিব সুখ দিচ্ছেন, তখন জানবে এটা তার জন্য ঢিল দেওয়া হচ্ছে।’’ অতঃপর তিনি এই আয়াতটাই পাঠ করলেন। (আহমাদ ৪/১৪৫)

৫। চোখ, কান এবং অন্তর হল মানুষের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মহান আল্লাহ বলছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাদের সেই বৈশিষ্ট্যগুলো ছিনিয়ে নিতে পারেন, যেগুলো তিনি তাদের দেহে দিয়ে রেখেছেন। আয়াতগুলি বিভিন্নভাবে পেশ করার অর্থ হল, কখনো সতর্ক করে, কখনো সুসংবাদ দিয়ে, কখনো লোভ দেখিয়ে, কখনো ভয় দেখিয়ে, আবার কখনো অন্যভাবেও।

৬। (بَغْتَةً অকস্মাৎ) বলতে রাত এবং (جَهْرَةً প্রকাশ্য) বলতে দিনকে বুঝানো হয়েছে। এটাকেই সূরা ইউনুসে{ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا} বলা হয়েছে। অর্থাৎ, দিনে আযাব আসুক অথবা রাতে। জাতিসমূহের ধ্বংসের জন্য এ আযাব তাদের উপরেই আসে, যারা যালেম ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়। অর্থাৎ, কুফরী, বিরুদ্ধাচরণ এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় সীমালঙ্ঘন করে।

৭। রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। অতঃপর যারা ঈমান আনবে ও নিজেকে সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

৮। তাদের শাস্তি এই জন্য হবে যে, তারা কুফরী এবং মিথ্যাজ্ঞান করার পথ অবলম্বন করেছে। আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর নির্দেশাবলীর কোন পরোয়া করেনি। তাঁর হারামকৃত ও নিষিদ্ধ কার্যকলাপে লিপ্ত থেকেছে

৯। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলতে বলেছেন যে, আমার ও তোমাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে চক্ষুষ্মান ও অন্ধের পার্থক্য। তোমাদের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এ কারণেই। আমার কাছে আল্লাহর কোন গোপন ধনভাণ্ডার আছে অথবা আমি গায়েবের খবর জানি বা মানবিক দুর্বলতা থেকে আমি মুক্ত-এ জাতীয় কোন বৈশিষ্টের কারণে তোমাদের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না ?

Sisters’ Forum In Islam.com

সূরা আন'আমঃ ৬ষ্ঠ রুকু(৫১-৫৫)আয়াত

১। যারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহর কাছে একত্রিত হওয়ার আশংকা করে, তাদেরকে কুরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন।" কারণ, তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে। অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না' কথার অর্থ হল, তাদের জন্য, যারা জাহান্নামের আযাবের যোগ্য বিবেচিত হয়ে গেছে। কেননা, মু'মিনদের জন্য তো আল্লাহর নেক বান্দারা আল্লাহর নির্দেশে সুপারিশ করবেন

২। সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা বলেনঃ আমরা ছয়জন রাসূলুল্লাহ সা এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় কতিপয় কুরাইশ সর্দার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ সা-কে বললেন, তুমি এদের তাড়িয়ে দাও, যাতে তারা আমাদের উপর কথা বলতে সাহস না পায়। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি ছিলাম, ইবন মাসউদ ছিলেন, হুযাইলের এক লোক ছিলেন, বিলাল ছিল, আরও দু'জন লোক ছিল যাদের নাম উল্লেখ করব না। তখন রাসূলের মনে এ ব্যাপারে আল্লাহ যা উদয় করার তার কিছু উদয় হয়েছিল, তিনি মনে মনে কিছু বলে থাকবেন, তখনি আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। [মুসলিম: ২৪১৩]

৩। সমাজের নিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারীর দরিদ্র, অভাবী ও কপর্দকহীনদেরকে সর্বপ্রথম ঈমান আনার সুযোগ দান করে আমি ধন ও বিত্তের অহংকারে মত্ত লোকদেরকে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেছি৷

৪। যারা সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে বহু লোক এমনও ছিলেন, যারা জাহেলী যুগে বড় বড় গোনাহ করেছিলেন৷ এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেলেও ইসলাম বিরোধীরা তাদের পূর্ববর্তী জীবনের দোষ ও কার্যাবলীর জন্য তাদেরকে বিদ্রুপ করতো ও খোঁটা দিতো৷ এর জবাবে বলা হচ্ছে: ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দাও৷ তাদেরকে বলো, যে ব্যক্তি তাওবা করে নিজের সংশোধন করে নেয় তার পেছনের গোনাহের জন্য তাকে পাকড়াও করা আল্লাহর রীতি নয়৷ যখন আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত করেন, তখন তিনি আরশে লিখে দেন যে, " إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ অবশ্যই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী।" (বুখারী, মুসলিম)

৫। আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করার কারন যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এ ধরনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন দলীল, প্রমাণ ও নিদর্শনের পরও যারা নিজেদের কুফরী, অস্বীকার ও অবাধ্যতার ওপর জিদ ধরে চলছে, তাদের অপরাধী হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে৷ এ সংগে এ সত্যটি দিবালোকের মত স্বচ্ছ হয়ে ভেসে উঠছে যে, আসলে এসব লোক নিজেদের গোমরাহী প্রীতির কারণেই এ পথে চলছে৷ সত্যপথে চলার স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি অথবা নিজেদের এ গোমরাহীর পক্ষেও তাদের কাছে কিছু দলীল-প্রমাণ আছে, এ কারণে তারা এ পথে চলছে না৷

Sisters' Forum In Islam.com

সূরা আন'আমঃ ৭ম রুকু(৫৬-৬০)আয়াত

১। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলছেন- বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাক, তাদের ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলুন, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করলে আমি বিপথগামী হব এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।
নিশ্চয় আমি আমার রব- এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা এতে মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তা আমার কাছে নেই। হুকুম কেবল আল্লাহর কাছেই, তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।
২। আমার চাওয়ার কারণে যদি আল্লাহ তাআলা সত্বর আযাব প্রেরণ করতেন অথবা তিনি যদি এ জিনিসকে আমার এখতিয়ারাধীন করে দিতেন, তাহলে তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আযাব প্রেরণ করে সত্বর ফায়সালা করে দেওয়া হত। কিন্তু এ ব্যাপারটা যেহেতু সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তাই তিনি না আমাকে এর এখতিয়ার দিয়েছেন, আর না এটা সম্ভব যে, তিনি আমার চাওয়া অনুযায়ী সত্বর আযাব প্রেরণ করবেন।
৩।) كِتَابٌ مُبِيْنٌ সুস্পষ্ট কিতাব) বলতে 'লাওহে মাহফূয' বুঝানো হয়েছে। এই আয়াত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, 'আলেমুল গায়ব' (অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা) কেবল মহান আল্লাহর সত্তা। গায়েবের সমস্ত ভান্ডার তাঁরই কাছে।
"গায়বের চাবি হল পাঁচটি। কিয়ামত কখন ঘটবে, বৃষ্টি কোথায় কখন হবে, মায়ের গর্ভাশয়ে কি বাচ্চা আছে, কাল কি ঘটবে এবং মৃত্যু কখন আসবে? এই পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই। (বুখারীঃ তাফসীর সূরা আনআম)
৪। সুষুপ্তি বা সুনিদ্রাকে মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই জন্যই এ (ঘুম)-কে ছোট মৃত্যু এবং প্রকৃত মরণকে বড় মৃত্যু বলা হয়। রাত ও দিনের এবং ছোট মৃত্যুর কবল থেকে পুনরায় জেগে ওঠার এই ধারাবাহিকতা মানুষের বড় মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ, পুনরায় কিয়ামতের দিন জীবিত হয়ে সকলকে আল্লাহর কাছেই উপস্থিত হতে হবে।

সূরা আন’আমঃ ৮ম রুকু(৬১-৭০)আয়াতঃ ১ম স্লাইড

১। তিনিই স্বীয় দাসগণের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং (কর্তব্যে) তারা ত্রুটি করে না।

2. আয়াতে আত্মাকবযকারী ফিরিশতাদের জন্য) رُسُلُদূতগণ তথা বহুবচন শব্দ) ব্যবহার করা হয়েছে। যার দ্বারা বাহ্যতঃ এটাই মনে হচ্ছে যে, আত্মাকবযকারী ফিরিশতা একজন নন, বরং একাধিক।

৩। আয়াতে আত্মাকবযকারী ফিরিশতাদের জন্য) رُسُلُদূতগণ তথা বহুবচন শব্দ) ব্যবহার করা হয়েছে। যার দ্বারা বাহ্যতঃ এটাই মনে হচ্ছে যে, আত্মাকবযকারী ফিরিশতা একজন নন, বরং একাধিক। মুফাসসিরগণ এইভাবে করেছেন যে, কুরআনে আত্মা কবয করার সম্পর্ক আল্লাহর সাথেও করা হয়েছে।
{“ {اللهُ تَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَاআল্লাহ মানুষের মৃত্যুর সময় তাদের আত্মাসমূহ কবয করে নেন।” (সূরা যুমার ৪২) অনুরূপ এর সম্পর্ক একটি ফিরিশতা (মালাকুল মাউত)এর সাথেও করা হয়েছে।{“ {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْবলে দাও, তোমাদের আত্মাসমূহ সেই ফিরিশতা কবয করেন, যাঁকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।” (সূরা সাজদাহ ১১) এইভাবে এর সম্পর্ক একাধিক ফিরিশতার সাথেও করা হয়েছে। যেমন, এখানে এবং সূরা নিসার ৯৭নং আয়াতে ও সূরা আনআমের ৯৩নং আয়াতেও করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর সাথে এর সম্পর্ক এই জন্য যে, তিনিই প্রকৃত নির্দেশদাতা বরং তিনিই আসল কর্তা (মৃত্যু সংঘটনকারী)।

৪।৬৩ ও ৬৪ নং আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা’আলা মুশরিকদেরকে হুশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন যে, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য দেব-দেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকে আহবান কর, কখনো প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং কখনো মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।
কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও যখন তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মূর্খতা! কুরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি মানুষের দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলা-কৌশলকেও তার প্রদত্ত নেয়ামত হিসেবে ব্যবহার করা। এছাড়া নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই

৫। আল্লাহর শাস্তি তিন প্রকারঃ (১) যা উপর দিক থেকে আসে, (২) যা নিচের দিক থেকে আসে এবং (৩) যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের আকারে সৃষ্টি হয়। এ সব প্রকার আযাব দিতে আল্লাহ্ তা’আলা সক্ষম।
নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, “আমি আল্লাহ তাআলার কাছে তিনটি দু’আ করি। (ক) আমার উম্মতকে ডুবিয়ে যেন ধ্বংস না করা হয়। (খ) ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাদের বিনাশ সাধন যেন না হয়। (গ) তাদের আপোসে যেন লড়াই-ঝগড়া (গৃহযুদ্ধ) না হয়। মহান আল্লাহ প্রথম দু’টি দু’আ কবুল করলেন এবং তৃতীয় দু’আ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন।” (সহীহ মুসলিম ২২১৬নং) অর্থাৎ, আল্লাহর জ্ঞানে এ কথা ছিল যে, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ সংঘটিত হবে। আর তার কারণ হবে আল্লাহর অবাধ্যতা এবং কুরআন ও হাদীস থেকে বিমুখতা।
তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবে না। (সূরা ফাত্বির ৪৩)
তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধ করতেই থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম।” [সূরা হুদ: ১১৮-১১৯]

Sisters’Forum In Islam.com

সূরা আন’আমঃ ৮ম রুকু(৬১-৭০)আয়াতঃ ২য় স্লাইড

৬। আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যে, আমি তোমাদেরকে হিদায়াতের পথে এনেই ছাড়ব। বরং আমার কাজ কেবল দাওয়াত ও তবলীগ করা। { فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}সুতরাং যার ইচ্ছা সে বিশ্বাসী হোক, আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাসী হোক। (সূরা কাহ্‌ফ ২৯)
প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।
৭। আয়াতে সম্বোধন নবী করীম (সাঃ)-কে করা হলেও এই সম্বোধন প্রকৃতপক্ষে সকল মুসলিম উম্মতকে।এমন সব মজলিস, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধি-বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়। অথবা কার্যতঃ যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-কে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। কিংবা যেখানে বিদআতীরা অপব্যাখ্যা ও অসঙ্গত কূটার্থ নির্ণয়ের মাধ্যমে আল্লাহর আয়াতসমূহের হেরফের করে। এই ধরনের মজলিসে অন্যায় কথার প্রতিবাদ করার এবং সত্যকে তুলে ধরার জন্য অংশ গ্রহণ করা তো বৈধ, অন্যথা সে মজলিসে অংশ গ্রহণ করা মহাপাপ এবং আল্লাহর ক্রোধের কারণও।
‘আমার উম্মতকে ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গোনাহ এবং যে কাজ অন্য কেউ জোর-যবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গোনাহ থেকে অব্যাহতি দান করেছেন। [ইবনে মাজাহঃ ২০৪০, ২০৪৩]
৮।তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের নয়। তবে উপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য, যাতে তারাও তাকওয়া অবলম্বন করে।
৯। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা দ্বীনকে ক্রীড়া ও কৌতুক করে রেখেছে। এর দুটি অর্থ হতে পারেঃ (এক) তাদের জন্য সত্য দ্বীন ইসলাম প্রেরিত হয়েছে; কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। (দুই) তারা আসল দ্বীন পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে।
রাসূলুল্লাহ সা ও সাধারণ মুসলিমদেরকে দুটি নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ (এক) উল্লেখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ইতিবাচকভাবে তাদেরকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং (দুই) আল্লাহ্ তা’আলার আযাবের ভয় প্রদর্শন করা।
আল্লাহ অপরাধীকে যখন শাস্তি দেবেন, তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো সুপারিশ কার্যকর হবে না এবং কোন অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হবে না।তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্য দেয়া হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, “এ পানি তাদের নাড়িভূড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে।” [সূরা মুহাম্মাদ: ১৫] এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে।

সূরা আন'আমঃ ৯ম রুকু(৭১-৮২)আয়াতঃ ১ম স্লাইড

১।আয়াত দ্বারা আরো জানা গেল যে, যারা আখেরাতের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংস্‌গৰও অপরের জন্য মারাত্মক। ঈমানদার হওয়ার পরে কি আমরা কুফরীতে ফিরে যাব? [আইসারুত তাফসীর]কিন্তু সে ঈমানদার বন্ধুদের এ আহবানে সাড়া দেয় না। [মুয়াস্‌সার] কুফরী ও শিরক অবলম্বন করে যে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, সে পথহারা পথিকের মত হিদায়াতের দিকে আসতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা যদি তার জন্য হিদায়াত নির্ধারণ করে থাকেন, তবে অবশ্যই আল্লাহর তাওফীকে সে সঠিক পথ পেয়ে যাবে। কেননা, হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা তাঁরই কাজ। যেমন, অন্যত্র বহু স্থানে বলা হয়েছে।{ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} ''অবশ্যই আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না, যাকে তিনি ভ্রষ্ট করেন এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না।'' (সূরা নাহল ৩৭)

২। আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন বিশ্বের প্রতিপালকের অনুগত হয়ে যাই। আর আমরা যেন নামায কায়েম করি এবং তাঁকে ভয় করি।নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া আল্লাহভীরুতা ও নম্রতা ব্যতীত সম্ভব নয়। তিনি বলেন, { وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। (সূরা বাক্বারাহ ৪৫)

৩। তিনি যথা উদ্দেশ্যে ও মহান লক্ষ্যে বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, এগুলোকে অনর্থক-লাভহীন (খেল-তামাশার জন্য) সৃষ্টি করেননি। আর তা হল, সেই আল্লাহকে স্মরণ এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। সেই দিনকে স্মরণ কর অথবা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তাঁর (كُنْ হও) শব্দ দ্বারা তিনি যা চাইবেন, তা-ই হয়ে যাবে।

صُوْرٌবলতে সেই শিঙ্গাকে বুঝানো হয়েছে, যার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে যে, ইস্রাফীল ফিরিশতা (আঃ) সেটাকে মুখে নিয়ে মস্তক নত করে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে বলা হবে, তুমি তাতে ফুঁ দাও। (ইবনে কাসীর) আবূ দাউদ এবং তিরমিযীতে আছে যে, ''সূর একটি বাঁশি, যাতে ফুঁ দেওয়া হবে। (হাদীস নং ৪৭৪২-৩২৪৪) প্রথমে ফুঁকে বিশ্ব-জাহানের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে, সবকিছু ওলট পালট ও লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুঁকে নতুন প্রকৃতি ও নতুন আইন কানুন নিয়ে আর একটি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে৷

৪। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পিতা আযরকে বললেন, আপনি স্বহস্তে নির্মিত স্বীয় উপাস্য স্থির করেছেন। আমি আপনাকে এবং আপনার গোটা সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর পিতার নাম 'আযর' বলেই প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিকগণ ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার দু'টি নাম উল্লেখ করেছেন। আযর এবং তারেখ। হতে পারে দ্বিতীয় নামটি আসলে তার উপাধি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ। তাই গোটা আরব তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা একমত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর একটি তর্কযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমাপূজা ও তারকাপূজার বিপক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন।

৫। ' مَلَكُوْتٌমুবালাগা' (আধিক্যবোধক) শব্দ। যেমন, رَغْبَةٌথেকে رَغَبُوتٌআর رَهْبَةٌথেকে رَهَبُوتٌইত্যাদি। এর অর্থ, রাজত্ব, উদ্দেশ্য সৃষ্টিকুল। অথবা আল্লাহর প্রতিপালকত্ব ও উপাস্যত্ব। অর্থাৎ, আমি তাঁকে তা দেখালাম এবং তা জানার তাওফীক দিলাম। কিংবা অর্থ হল, আরশ থেকে নিয়ে পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্যন্ত আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্য উপস্থাপন ও প্রকাশ করলাম এবং তাঁকে তা দেখালাম। (ফাতহুল ক্বাদীর)

Sisters' Forum In Islam.com

সূরা আন’আমঃ ৯ম রুকু(৭১-৮২)আয়াতঃ ২য় স্লাইড

৬। অস্তগামী উপাস্যদেরকে পছন্দ করি না। কারণ, অস্ত যাওয়া হল, অবস্থার পরিবর্তন ঘটার দলীল এবং তা হল, ধ্বংস হওয়ার দলীল। আর ধ্বংসশীল কখনো উপাস্য হতে পারে না ।ইবরাহীম (আঃ) অতি সূক্ষ্মভাবে চাঁদ ও সূর্য-পূজারীদের জন্য তাদের উপাস্যদের অযোগ্যতার কথা সুস্পষ্ট করেন। সেই সমস্ত জিনিসের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, যেগুলোকে তোমরা আল্লাহর শরীক নির্ণয় করেছ এবং যেগুলোর তোমরা পূজাও করছ। কারণ, এদের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়। কখনো উদয় হয়, আবার কখনো অস্ত যায়। আর এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এরা সৃষ্টি এবং এদের স্রষ্টা এমন কেউ আছেন, যাঁর নির্দেশের এরা আওতাধীন। আর এরা যখন নিজেরাই সৃষ্টি এবং অন্য কারো আওতাধীন, তখন কারো ইষ্টানিষ্টের উপর কিভাবে ক্ষমতা রাখতে পারে?

৭। আমি একনিষ্ঠভাবে তার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

৮। কুরআনের মূল আয়াতে ’তাযাক্কুর’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে৷ এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি গাফলতি ও ভুলে মধ্যে ডুবে ছিল তার হঠাৎ গাফলতি থেকে জেগে ওঠে যে, জিনিস থেকে গাফেল হয়ে ছিল তার স্মরণ করা৷ এরপরও কি তোমাদের চেতনার উদয় হবে না" হযরত ইবরাহীমের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, তোমরা যা কিছু করছো তোমাদের আসল ও যথার্থ রব সে সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন৷ তিনি সব জিনিসের বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন৷ কাজেই এ সত্য অবগত হয়েও কি তোমরা সচেতন হবে না?

৯। মু’মিন ও মুশরিকদের মধ্যে। মু’মিনদের কাছে তো তাওহীদের প্রচুর দলীল বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে মুশরিকদের কাছে আল্লাহর অবতীর্ণ কোন দলীল নেই, আছে কেবল বাতিল ধারণাসমূহ এবং (বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন) অপ্রাসঙ্গিক অপব্যাখ্যা। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, নিরাপত্তা ও মুক্তি পাওয়ার যোগ্য কারা হবে?

১০। আয়াতে এখানে ‘যুলম’ বলতে শিরককে বুঝানো হয়েছে। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যুলুমের সাধারণ অর্থ (অবজ্ঞা, ত্রুটি, পাপ এবং অত্যাচার ইত্যাদি) মনে করে বড়ই অস্থির হয়ে পড়লেন এবং রসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বলতে লাগলেন, ‘ أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُআমাদের মধ্যে এমন কেই বা আছে, যে যুলুম করেনি?’ তখন রসূল (সাঃ) বললেন, ‘‘এ থেকে উদ্দেশ্য সে যুলুম নয়, যেটা তোমরা মনে করছ, বরং এ থেকে উদ্দেশ্য শিরক। যেমন, লুকমান (আঃ) তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (لقمان: ১৩)) ‘‘অবশ্যই শিরক হল বড় যুলুম।’’ (সহীহ বুখারীঃ তাফসীর সূরা আনআম) কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনে, অতঃপর আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী এবং তার ইবাদাতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ প্রাপ্ত।

সূরা আন'আমঃ ১০ম রুকু(৮৩-৯০)আয়াত

১। আল্লাহর একত্ববাদের এমন যুক্তি ও দলীল, যার কোন উত্তর ইবরাহীম (আঃ)-এর জাতির কাছে ছিল না। মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-এর সে কথার সত্যায়ন করে বললেন, "যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাস (ঈমান)-কে যুলুম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।"

যাকে ইচ্ছা আমি মর্যাদায় উন্নত করি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

২। আমরা তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব, এদের প্রত্যেককে হিদায়াত দিয়েছিলাম; পূর্বে নূহকেও আমরা হিদায়াত দিয়েছিলাম এবং তাঁর বংশধর দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও; আর এভাবেই মুহসিনদের পুরস্কৃত করি; এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলয়্যাসকেও আমি সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। এবং ইসমা'ঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকেও (হিদায়াত দিয়েছিলাম) আর তাদের প্রত্যেককে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম সৃষ্টিকুলের উপর। এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম, তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে।

'ইজতিবা'র অর্থ হল, মনোনয়ন ও নির্বাচন করা এবং স্বীয় বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে গণ্য করে নেওয়া ও তাদের সাথে মিলিয়ে নেওয়া।

৩। ১৮ জন নবীদের নাম উল্লেখ বলা হয়েছে যে এই নবীরাও যদি শিরক করে বসত, তবে তাদেরও সমস্ত আমল নিষ্ফল ও বিনষ্ট হয়ে যেত। যেমন, অন্যত্র নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা বলেন, { " لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} হে নবী! যদি তুমিও শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে।" (সূরা যুমার ৬৫) অথচ নবীদের দ্বারা শিরক সংঘটন হওয়া সম্ভবই নয়।

৪। এখানে নবীদেরকে তিনটি জিনিস দেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে৷

এক, কিতাব অর্থাৎ আল্লাহর হেদায়াতনামা৷ দুই, হুকুম অর্থাৎ এ হেদায়াতনামার সঠিক জ্ঞান, তার মুলনীতিগুলোকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন ব্যাপারে প্রয়োগ করার যোগ্যতা এবং বিভিন্ন জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকর মত প্রতিষ্ঠিত করার আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা৷ তিন, নবুওয়াত অর্থাৎ তিনি এ হেদায়াতনামা অনুযায়ী আল্লাহর সৃষ্টিকে পথ দেখাতে পারেন এমন একটি দায়িত্বশীল পদ ও মর্যাদা৷

কিছুসংখ্যক সম্বোধিত ব্যক্তি নবীর কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণের নির্দেশ বর্ণনা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে রাসুল সা কে দুঃখ করতে না করা হয়েছে। কেননা,রাসুলের নবুওয়াত স্বীকার করার জন্য একটি বিরাট জাতি স্থির করে রাখা হয়েছে, তারা অবিশ্বাস করবে না। রাসূলুল্লাহ সা-এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত মুসলিম এ জাতির অন্তর্ভুক্ত।

৫। তারা, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন, কাজেই আপনি তাদের পথের অনুসরণ করুন। বলুন, এর জন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না, এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ।

Sisters' Forum In Islam.com

সূরা আন'আমঃ ১১তম রুকু(৯১-৯৪)আয়াত

১। এ আয়াতে ঐসব লোকের জবাব দেয়া হয়েছে, যারা বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কখনো কোন গ্রন্থ নাযিলই করেননি, গ্রন্থ ও রাসূলদের ব্যাপারটি মূলতঃ ভিত্তিহীন।এটি ছিল ইহুদীদের উক্তি৷ যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাবী ছিল, আমি নবী এবং আমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবে কুরাইশ কাফের সম্প্রদায় এবং আরবের অন্যান্য মুশরিকরা এ দাবীর যথার্থতা অসুন্ধান করার জন্য ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে যেতো এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করতো, তোমরাও তো নবী-রসূলদের মানো, বলো সত্যিই কি এ ব্যক্তির কাছে আল্লাহর কালাম নাযিল হয়েছে৷ এর জওয়াবে তারা যা বলতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কট্টর বিরোধী পক্ষ বিভিন্ন জায়গায় সে কথাগুলো বলে বলে লোকদেরকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করতো৷ তাই ইসলাম বিরোধীরা ইহুদীদের যে উক্তিটিকে প্রমাণ হিসেবে খাড়া করেছিল সেটি এখানে উদ্ধৃত করে তার জওয়াব দেয়া হচ্ছে৷ তুমি বল, 'আল্লাহই'। অতঃপর তাদেরকে নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হতে দাও।

২। এটি বরকতময় কিতাব, যা আমরা নাযিল করেছি, যা তার আগের সব কিতাবের সত্যায়নকারী এবং যা দ্বারা আপনি মক্কা ও তার চারপাশের মানুষদেরকে সতর্ক করেন। আর যারা আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, তারা এটাতেও ঈমান রাখে এবং তারা তাদের সালাতের হিফাযত করে।

মানুষের ওপর আল্লাহর কালাম নাযিল হতে পারে এবং কার্যত হয়েছেও এরি স্বপক্ষে দেয়া হয়েছে প্রথম যুক্তিটি৷ এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে কালামটি নাযিল হয়েছে সেটি আল্লাহরই কালাম, এর স্বপক্ষে দেয়া হচ্ছে এ দ্বিতীয় যুক্তিটি৷ এ সত্যটি প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ হিসেবে চারটি কথা পেশ করা হয়েছে৷

এক: এ কিতাবটি বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ৷ অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য এর মধ্যে সর্বোত্তম মূলনীতি পেশ করা হয়েছে৷ এখানে নির্ভুল ও সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের শিক্ষা দেয়া হয়েছে সৎকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির উপদেশ দেয়া হয়েছে, পাক-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে.

দুই: এর আগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব হেদায়াতনামা এসেছিল এ কিতাব সেগুলোয় যা কিছু পেশ করা হয়েছিল তার সত্যতা প্রমাণ করে এবং তার প্রতি সমর্থন যোগায়৷

তিন: প্রত্যেক যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে যা মানুষকে গাফিলতির নিঁদ থেকে জাগিয়ে সতর্ক করা এবং বিপথগামী লোকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই এর উদ্দেশ্য৷

চার: মানুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা দুনিয়া পূজারী ও প্রবৃত্তি লালসার দাসত্বে জীবন উৎসর্গকারী, এ কিতাব তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে সমবেত করেনি বরং নিজের চারদিকে এমন সব লোককে সমবেত করেছে যাদের দৃষ্টি দুনিয়ার সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে আরো আগে চলে যায়৷ তারপর এ কিতাবের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে তারা নিজেদের আল্লাহ প্রীতির কারণে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করে৷

৩। 'যালেম' বলতে প্রত্যেক যালেমকে বুঝানো হয়েছে এবং এর মধ্যে আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকারকারী ও নবুঅতের মিথ্যা দাবীদারগণ সর্বপ্রথম শামিল থাকবে। غَمَرَاتٌথেকে মৃত্যু-যন্ত্রণাকে বুঝানো হয়েছে। 'ফিরিশতাগণ হাত বাড়িয়ে' অর্থাৎ, জান কবয করার জন্য।) اَلْيَوْمَআজ) অর্থাৎ, জান কবয করার দিন। আর এই দিন হল আযাব শুরু হওয়ার সময়; যার প্রথম স্থান হল কবর। আর এ থেকে এ কথাও সুসাব্যস্ত হয়ে যায় যে, কবরের আযাব সত্য। স্মরণ থাকে যে, কবর বলতে উদ্দেশ্য বারযাখী জীবন। অর্থাৎ, ইহজগতের জীবনের পর এবং পরজগতের জীবনের (কিয়ামত ঘটার) পূর্বে এটা একটি মধ্যজগতের জীবন। যার সময়কাল হল, মানুষের মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত। এটাকে বলা হয় বারযাখী জীবন। মরণের পর এ হল বারযাখী জীবন, যেখানে আযাব দেওয়ার শক্তি মহান আল্লাহর আছে।

৪। আর অবশ্যই তোমরা আমাদের কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ, যেমন আমরা প্রথম বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম; আর আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা তোমাদের পিছনে ফেলে এসেছ। আর তোমরা যাদেরকে তোমাদের ব্যাপারে (আল্লাহর সাথে) শরীক মনে করতে, তোমাদের সে সুপারিশকারিদেরকেও আমরা তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হয়েছে এবং তোমরা যা ধারণা করেছিলে তাও তোমাদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

সূরা আন'আমঃ ১২তম রুকু(৯৫-১০০)আয়াত

১।আল্লাহ্ তা'আলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত বস্তু যেমন, বীর্য ও ডিম- এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করে দেন- যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়। [জালালাইন; মুয়াসসার]এগুলো সব এক আল্লাহর কাজ। অতঃপর এ কথা জেনে-শুনে তোমরা কোন দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ? তোমরা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ-বিদূরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছ। [মুয়াসসার]

২। অন্ধকার ও আলোর স্রষ্টাও তিনিই। তিনি রাতের অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল প্রভাত সৃষ্টি করেন। ফলে প্রতিটি জিনিসই আলোকিত হয়ে যায়।অর্থাৎ, রাতকে অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন, যাতে মানুষ উজ্জ্বলতার সমস্ত ব্যস্ততাকে দূর করে বিশ্রাম নিতে পারে।"সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাতার কাটে।" [সূরা ইয়াসীন: ৪০]

বাক্যের শেষে আল্লাহর দুটি গুণ বাচক নাম পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী' উল্লেখ করা হয়েছে। তার অপার শক্তির কারণে সমস্ত কিছু তার অনুগত বাধ্য হয়েছে। আর তার পরিপূর্ণ জ্ঞানের কারণে কোন গোপন বা প্রকাশ্য সবকিছু তার আয়ত্বাধীন রয়েছে।

৩।সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এগুলো সৃষ্টি করার পিছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, স্থল ও জলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করে নিতে পারে। [মুয়াসসার]

৪। আল্লাহ তা'আলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা থেকে অর্থাৎ আদম আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্য একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি স্বল্পকালীন অবস্থানস্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন।অধিকাংশ মুফাসসিরদের নিকট مُسْتَقَرٌّবলতে মায়ের গর্ভাশয় এবং مُسْتَوْدَعٌবলতে বাপের পৃষ্ঠদেশকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর, ইবনে কাসীর)

তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। [সূরা আল-ইনশিকাক: ১৯] এর সারমর্ম এই যে, আখেরাতের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন মুসাফিরসদৃশ। বাহ্যিক স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়ও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করতে থাকে।

৯৫-৯৯ আয়াতসমূহে প্রথমে অধঃজগতের বস্তুসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী। এরপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এক. মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগানের বর্ণনা এবং দুই. মানব ও জীবজন্তুর বর্ণনা। এরপর শূন্য জগতের উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ সকাল ও বিকাল। এরপর উর্ধ্ব জগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পূর্ণ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এসব সত্ত্বেও লোকেরা জ্বিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করলো, ৬৭ অথচ তিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা৷ আর তারা না জেনে বুঝে তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা তৈরী করে ফেললো, ৬৮ অথচ এরা যেসব কথা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং তার উর্ধে৷

সূরা আন’আমঃ ১৩তম রুকু(১০১-১১০)আয়াত

১। আল্লাহর পরিচয়ঃ

তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তার সন্তান হবে কিভাবে? তার তো কোন সঙ্গিনী নেই। আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবগত।

তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের রব; তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; কাজেই তোমরা তাঁর ইবাদত কর; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন এবং তিনি সূক্ষ্মদশী, সম্যক অবহিত।

২।আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌছে গেছে। [আল-মানার] অর্থাৎ কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বিভিন্ন মু’জিযা আগমন করেছে। [ইবন কাসীর] তাছাড়া তোমরা রাসূলের চরিত্র, কাজকর্ম ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করছ। এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়। অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, সে নিজেরই উপকার সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। [আল-মানার আইসারুত তাফসীর, মুয়াসসার]

আমি তাওহীদ এবং তার দলীলাদিকে এমনভাবে পরিষ্কার ভাষায় বিভিন্ন আকারে বর্ণনা করি যে, তা দেখে মুশরিকরা বলে, মুহাম্মাদ (সাঃ) কোথাও থেকে পড়ে এবং শিখে এসেছে। যেমন, অন্যত্র বলেন, { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا * وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا} “কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়, যা সে উদ্ভাবন করেছে এবং অন্য লোকেরা তাকে সাহায্য করেছে। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তারা বলে, এগুলো তো পূর্বকালের রূপকথা, যা সে লিখে রেখেছে।” (সূরা ফুরকানঃ ৪-৫) অথচ ব্যাপার এটা নয়, যা তারা মনে করে বা দাবী করে, বরং এই বর্ণনার উদ্দেশ্য হল বিবেকবান লোকদের জন্য পরিষ্কার আকারে ব্যাখ্যা করা, যাতে তাদের উপর হুজ্জত পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

৩। আপনার রব-এর কাছ থেকে আপনার প্রতি যা ওহী হয়েছে আপনি তারই অনুসরণ করুন, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

৪। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তারা শির্ক করত না। আর আমরা আপনাকে তাদের হিফাযতকারী বানাইনি এবং আপনি তাদের তত্ত্বাবধায়কও নন। আল্লাহর ইচ্ছা এক জিনিস এবং তাঁর সন্তুষ্টি আর এক জিনিস। তাঁর সন্তুষ্টি তো তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার মধ্যেই। তবে তিনি এর উপর মানুষকে বাধ্য করেননি। কেননা, বাধ্য করলে মানুষকে পরীক্ষা করা যেত না। পক্ষান্তরে আল্লাহর এখতিয়ারে তো এ কথা আছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে কোন মানুষ শিরক করার কোন ক্ষমতাই রাখত না।নবী করীম (সাঃ)-এর কেবল আহবানকারী এবং বার্তাবাহক হওয়ার মর্যাদাটুকু পরিষ্কার করে দেওয়া; যা রিসালাতের দাবী এবং তাঁর দায়িত্ব কেবল এই পর্যন্তই ছিল।

সূরা আন’আমঃ ১৩তম রুকু(১০১-১১০)আয়াত

৫। নবী করীম (সাঃ)ও বলেছেন, “তোমরা কারো পিতা-মাতাকে গাল-মন্দ করো না, কেননা, এইভাবে তোমরা স্বয়ং নিজেদের পিতা-মাতাকে গাল-মন্দ করার কারণ হয়ে যাবে।” (মুসলিমঃ ঈমান অধ্যায়) ইমাম শাওকানী লিখেছেন যে, এই আয়াত হল মন্দের উপকরণসমূহ বন্ধ করার মূল নীতির উৎস। (ফাতহুল ক্বাদীর)
কুরাইশ সর্দাররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললঃ হয় তুমি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হও, না হয় আমরা তোমার প্রভুকে গালি দিবো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। [তাবারী
৬। এ আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা স্বীয় জিদ ও নতুন সংস্করণ রচনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বিশেষ বিশেষ ধরণের মু’জিযা দাবী করছে।তাদের অস্বাভাবিক এ জিনিসের দাবী কেবল ধৃষ্টতা ও শত্রুতা স্বরূপ; হিদায়াত অর্জনের নিয়তে নয়। তাছাড়া এই মু’জিযার বিকাশ ঘটানোর সমস্ত এখতিয়ার আল্লাহরই হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের দাবীসমূহ পূরণ করবেন। কোন কোন ‘মুরসাল’ (সূত্রছিন্ন) বর্ণনায় এসেছে যে, মক্কার কাফেররা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে দাবী করল যে, সাফা পাহাড়কে সোনার বানিয়ে দিলে আমরা ঈমান আনব। তখন জিবরীল (আঃ) বললেন, এর পরও যদি তারা ঈমান না আনে, তবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আর এটা নবী করীম (সাঃ) পছন্দ করলেন না। (ইবনে কাসীর)
আয়াতে তাদের উক্তির জবাব দেয়া হয়েছে যে, মু’জিযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন।
এত নিদর্শন দেখার পরও যারা ঈমান আনেনি তারা আর ঈমান আনবে না। সুতরাং তাদের জন্য নতুন কোন মু’জিযা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। [সা’দী]
৭। প্রথমবার ঈমান না আনার কারণে তার শাস্তি তাদের উপর এমনভাবে এল যে, আগামীতেও তাদের ঈমান আনার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল। অন্তঃকরণ ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ এটাই। (ইবনে কাসীর) তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা তাদের নিজের উপর অপরাধ করে, তার অবারিত রহমত দর্শনের পরও তাতে অবগাহন না করে, সঠিক পথ দেখানোর পরও তাতে না চলে, তিনি তাদের থেকে সেটা গ্রহণ করার তাওফীক উঠিয়ে নেন। [সা’দী]

৭ম পারা সমাপ্ত

Sisters’Forum In Islam.com

আলহামদুলিল্লাহ!